প্রথম আলো

তারিখ 16 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

# ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা

স হ জি য়া ক ড় চা

**সৈয়দ আবুল মকসুদ**

কাঁথা-বালিশ নিয়ে ঢাকার হতভাগ্য মেসবাসী রাস্তায় নেমেছেন

গত শতকের বিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সরকারে ও বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী, এমপি, সচিব প্রভৃতি হয়েছিলেন, আমার একটি গবেষণার প্রয়োজনে, এমন কয়েকজনের আমি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তাঁদের অনেকের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি এখন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। বংশধরেরা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন, তাই তাঁদের নাম উল্লেখ না করা সংগত। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম আশির দশকের প্রথম দিকে। সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তির ছাত্রজীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে জানতে চেয়েছি তাঁরা কোথায় থাকতেন। জবাবে কেউ বলেছেন, কেউ থাকতেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে বা ফজলুল হক মুসলিম হলে; অধিকাংশই বলেছেন, তাঁরা থাকতেন মেসে বা লজিং বাড়িতে।

নগরীতে এখনো অগণিত মেস রয়েছে, কিন্তু লজিং জিনিসটি এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে অপরিচিত। কিন্তু আমাদের সময়েও, পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের শুরুতেও, যথেষ্টই ছিল। আমার কয়েকজন সহপাঠী মেসে থাকতেন এবং লজিংয়েও ছিলেন কেউ।

গণপরিবহনের সংকটসহ নানা রকম সমস্যা এখনো আছে, তা সত্ত্বেও এখনকার ছেলেমেয়েরা আমাদের সময়ের চেয়ে অনেক সুখী ও সমৃদ্ধ। উচ্চশিক্ষার আশায় গ্রাম থেকে ঢাকায় আসতেন মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাস করে। কেউ প্রথম কয়েক দিন আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কারও বাড়িতে লজ্জা-শরম খুইয়ে থাকতেন, তারপর মেস বা লজিংটজিং খুঁজে নিতেন।

ব্রিটিশ আমল থেকেই আমাদের সমাজে লজিংয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। যাঁদের অবস্থা একটু ভালো, থাকার মতো একটা বাড়তি খুপরিটুপরি আছে এবং স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়ে আছে, তাঁরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র বাড়িতে রাখতেন। তাতে উপকার হতো উভয় পক্ষেরই। যিনি থাকতেন তাঁকে বলা হতো 'লজিং মাস্টার'। তাঁর কাজ ছিল সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়ানো, বিনিময়ে থাকা-খাওয়া ফ্রি। সকালের নাশতা, দুপুরের ও রাতের খাবার সরপোশ দিয়ে ঢেকে বাড়ির ভেতর থেকে পাঠানো হতো। কোনো খাদ্য ভালো না লাগলেও, অথবা গরুর গোশত ঝালে মুখে দেওয়া না গেলেও, চোখ-মুখ বুজে খেয়ে নিতে হতো। অবস্থাটা সম্মানজনক ছিল না, কিন্তু উপায়ও ছিল না।

তবে লজিং রাখা এবং লজিং থাকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের জন্যই আশীর্বাদ হয়েছে। বিশেষ করে যে বাড়িতে ১৪-১৫ বছর বয়সী মেয়ে ছিল, সে বাড়ির গৃহকর্তা এবং লজিং মাস্টার পরস্পর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এশার নামাজ পড়ে একদিন পাশের বাড়ির কোনো মুরব্বি মাস্টারের ঘরে আসেন। পড়াশোনা কেমন চলেছে—এ কথা-সে কথার পরে তিনি একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক প্রশ্ন করেন—মাস্টার সাব, আমাগো বিলকিসেরে কেমন মনে অয়?

মাস্টার বলেন, কেমন মানে?

কেমন মানে, ধরেন যদি আপনেগো মধ্যে বিয়া অয় তা হইলে আপনার মত আছে কি না।

মত থাকা না-থাকার চেয়ে ঢাকায় থাকার বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ে হলে বাইরের ঘর থেকে প্রমোশন পাবেন ভেতরের ভালো ঘরটায়। চৌকির পরিবর্তে খাট। তা ছাড়া মুরব্বি চাচা প্রস্তাব দেওয়ার পরেই মাস্টারের মনে হয়, গোপীবাগের এই বাড়ি ছাড়াও গৃহকর্তা মেয়ের বাবার কমলাপুরেও পাঁচ কাঠা জমি আছে। অসম্মতির সুযোগ নেই। মাস্টার দাঁত বের করে হাসতেই সাত দিনের মধ্যে কাজি ডেকে কলমা পড়ানো হয়ে যায়। ওদিকে গ্রামে গরিব বাপ-মা পোস্টকার্ডে জানতে পারলেন, আল্লাহর অশেষ রহমতে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় আপনাদের ছেলের শাদি মোবারক তাড়াহুড়ার মধ্যে—।

ষাটের দশকের শুরুতে আমার বন্ধুবান্ধব, সহপাঠীদের জীবনেই এমনটি ঘটেছে। কারও বিয়ের সাক্ষী বা উকিল-বাবা হয়েছি। হয়তো তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। অনার্স-মাস্টার্সে তাঁরা ভালো ফল করেছেন। কেউ শিক্ষকতায় গেছেন। কেউ পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে স্বপ্নের চাকরিতে নির্বাচিত হয়ে লাহোর চলে গেছেন। বড় চাকরি পেয়ে একদিন আর লজিংবাড়ির কালো, মোটা ও নাক থ্যাবড়া মেয়েটিকে পছন্দ হয়নি। তাকে ডাকযোগে তালাকনামা পাঠিয়ে দিয়ে বড় ব্যবসায়ীর এক স্লিম সুন্দরী ও স্মার্ট মেয়েকে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করেছেন।

এ হলো লজিংবাড়ির উপাখ্যান। তবে লজিংয়ের চেয়ে মেস ভাড়া করেই থাকতেন বেশি। এখনো এই মহানগরীতে ছাত্র, ছোট চাকুরে, ছোটখাটো ব্যবসায়ীর প্রধান বাসস্থান মেস। মেসে থেকে তাঁরা পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন বা জীবিকা উপার্জন করেন। কেউ বাড়ি থেকে টাকা আনেন পড়ালেখার খরচ চালাতে, কেউ চাকরি করে বা ব্যবসা করে কিছু কামাই করে বাড়িতে বউ-বাচ্চাদের জন্য টাকা পাঠান। এই তো শিক্ষিত বাঙালির জীবন! মেসজীবনে বিড়ম্বনার শেষ নেই। এই শহরের ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচার দারুণ মর্মব্যথা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। এক ঘরে চার চৌকিতে চারজন। যাকে খুব সকালে কাজে যেতে হয়, সে মশারি টানিয়ে ঘুমাতে যায় ১১টায়। আর একজন বাতি জ্বালিয়ে পত্রিকা পড়া শুরুই করে রাত সোয়া ১১টায়। আর একজন গ্রামে তার খালাতো বোনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে গপ্প জুড়ে দেয় পৌনে ১২টায় এবং শেষ করে দেড়টায়। মাঝেমধ্যে মধ্যরাতে নিঃশব্দে খিক্ খিক্ করে হাসে। সে হাসিতে কারও কাঁচা ঘুম ভেঙে যায়। তাদের পিত্তি জ্বলে। একজন মশারির ভেতর থেকে বলে, কী জামান সাহেব, আপনাগো প্রেমালাপ শেষ অইল? আমাগো ঘুমের কম্ম কাবার। এবার একটু থামেন। কিন্তু কার কথা কে শোনে! কেউ মোবাইল ফোনে হিন্দি গান শোনে জোরে জোরে।

মেসবাড়ির সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা গোসলখানা ও ল্যাট্রিন। ল্যাট্রিন একটা। সকালে বদনা নিয়ে লাইন দেয় দুই রুমের আটজন। সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি করে যার কোষ্ঠবদ্ধতা রয়েছে সে। পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি একজন পায়খানায় বসে থাকলে বাইরে থেকে কেউ জোরে জোরে কাশে। যাদের আমাশয় বা একটু লুজ ভাব, ধরে রাখতে পারে না, তারা খেঁকিয়ে ওঠে—ভিতরে কেডা, বাইর অন তাড়াতাড়ি। এই ল্যাট্রিনকে কেন্দ্র করে মনোমালিন্য হয়, কথা-কাটাকাটি হয়। আবার মিলেমিশে থাকতেও হয়।

আলাদা একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকা একজন নিম্নমধ্যবিত্ত তো নয়ই, সম্পন্ন কৃষক ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র বা ছোট চাকুরের পক্ষেও সম্ভব নয়। মহানগরীতে এসে মেসে আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্প উপায় নেই। সুখে-দুঃখে জীবনের একটা লম্বা সময় মেসেই তাদের কাটাতে হয়।

গত পৌনে এক শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণি তৈরি হয়েছে এবং তাঁদের মাধ্যমে যে নতুন একটি মধ্যশ্রেণি গড়ে উঠেছে, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যাঁদের অবদান বিরাট, তাঁদের জন্য মেসের অবদান সবচেয়ে বেশি। গ্রাম থেকে শহরে এসে মেসবাড়িতে অল্প ভাড়ায় থাকা-খাওয়ার সুযোগ না থাকলে অর্ধেকের বেশি নিম্ন আয়ের গ্রামের মানুষের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতেন না। উচ্চশিক্ষা না পেলে সরকারি, আধা সরকারি চাকরিও পেতেন না, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে পারতেন না। জনপ্রতিনিধি হওয়ার আশাও পোষণ করতে পারতেন না। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হওয়াও কঠিন হতো।

মাস খানেক যাবৎ জঙ্গি নির্মূলের নামে ঢাকা ও অন্যান্য নগরীর মেসবাসীর জীবনে নেমে এসেছে অভিশাপ। ছোট-মাঝারি সরকারি চাকুরে থাকবেন কোথায়? সরকার তাঁদের কোয়ার্টার দেয় নাই। আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রাবাসে সবার সংকুলান হয় না। মেসই তাঁদের একমাত্র ভরসা। সরকারি নেতারা জঙ্গি আতঙ্কে আতঙ্কিত, মেসের মানুষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভয়ে আতঙ্কিত। মধ্যরাতে মেসের সবাই রয়েছেন ঘুমিয়ে। দরজায় সজোরে কেউ নাড়াচ্ছে কড়া। ঘুমচোখে দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল দরজায় দাঁড়িয়ে পুলিশ। ওই ঘরে যদি কারও বালিশ-তোশকের নিচে দুখানা ইসলামি বই পাওয়া যায়, তাহলে আর রেহাই নেই। পোশাক-পরিচ্ছদে ধর্মীয়ভাব থাকলে তো কথাই নেই। সন্দেহের তির তাঁদের দিকে। কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়া পরা সময়ের ব্যাপার।

কাঁথা-বালিশ নিয়ে ঢাকার হতভাগ্য মেসবাসী রাস্তায় নেমেছেন। প্রেসক্লাবের সামনে তাঁরা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। কেউ যদি জানে সে শ্রেণি হিসেবেই সন্দেহভাজন, সে তখন বন্ধুর মতো আচরণ করবে না। সে অবস্থান নেবে শত্রুপক্ষে। এভাবে সরকারের শত্রু কমবে না, বাড়বে। সরকারের নীতিনির্ধারকেরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি? যারা অন্ধকারের জীব, বাস করে অন্ধকার গুহায়, দিনের আলোতে রাজপথে মাঠে-ময়দানে তাদের টর্চলাইট ও হ্যারিকেন দিয়ে খুঁজে কোনো লাভ নেই। সেটা হবে স্রেফ পণ্ডশ্রম। গুহাবাসী প্রাণীদের খুঁজে বের করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারাই উপযুক্ত।

শুধু মেসের ভাড়াটেরা নয়, সন্দেহের আঙুল বাড়ির মালিকদের দিকেও। কোনো ভাড়াটের অপরাধের দায় বাড়িঅলার ওপর বর্তাতে পারে না। যদি কোনো ভাড়াটে বাড়িঅলার যোগসাজশে অপরাধ করে, তাহলে উভয়েই দোষী। অন্যদিকে কোনো বাড়ির মালিক কাউকে খুন করলে তার দায়ও তার কোনো ভাড়াটের ওপর পড়তে পারে না।

দেশের কোথাও কোনো নাশকতামূলক ঘটনা ঘটলেই সমাজের সব জায়গায় নাড়া দেওয়া সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝেই খুনখারাবি হয়। সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের রাস্তায় নামানোর কথা শুনিনি।

স্কুলের বাচ্চারা জঙ্গিবাদের কী বোঝে? জঙ্গিবাদ শব্দটির সঙ্গেই বালক-বালিকাদের পরিচয় করানো ঠিক নয়। রাস্তায় রোদ-বৃষ্টির মধ্যে দাঁড় করিয়ে ওদের মুখে স্লোগান দিয়ে জঙ্গিবাদ ঠেকানো যায় না। বালক-বালিকার মধ্যে শুভবোধ ও ভালোর জাগ্রত করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সে শ্রেণিকক্ষে সম্ভব, রাস্তায় নিয়ে নয়।

আমরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র ও সমাজ চাই। সে জন্য প্রয়োজন প্রজ্ঞা ও পরিমিতিবোধ নিয়ে কাজ করা—লোক দেখানো প্রচারণা নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক, মেসের ভাড়াটে, বাড়ির মালিক, মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আতঙ্কিত জঙ্গিমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

● সৈয়দ আবুল মকসুদ : লেখক ও গবেষক।